পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ভাঙন—কারণ ও প্রতিকার

তপোব্রত সান্যাল

নদীর ভাঙন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুর্ভাবনা সাম্প্রতিক নয়। সংবাদ-মাধ্যমের প্রচারের ফলে ও রাজ্যে নদীর—বিশেষ করে গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদীর ভাঙনের ভয়াবহতা জনসমক্ষে প্রকট হয়েছে। এ নিয়ে লেখালেখি ছাড়াও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে একাধিক স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞের মতামত প্রায়ই প্রচার করা হয়েছে। এ সব আলোচনা ও কথাবার্তায় ভাঙনের মূল কারণ যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সরকারি দুর্নীতি ও ঔদাসীন্যের কথা। সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছে যেন নদীর ভাঙন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী কেবল রাজ্যের সেচ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর। রাজ্য সরকারের সময়োচিত দায়িত্ব-পালনে বিচ্যুতি অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু নদীর ভাঙনের জন্য সরকারই সর্বাংশে দায়ী এমন বলাও সঙ্গত নয়। বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরে যাওয়ার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা, যদিও স্বল্প পরিসরে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়।

নদীর ভাঙনের পেছনে একাধিক কারণ আছে। নদীর স্রোতবিন্যাস ও প্রবাহের মাত্রা এবং সেই সঙ্গে নদী-গর্ভ ও নদীতটে মৃৎস্তরের প্রকৃতিই নদীর ভূমিক্ষয়ের প্রবণতা নির্ধারণ করে। নদীর কূল ও গর্ভের মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে মূলত সে অঞ্চলের ভূ-তত্ত্বীয় গঠনের ওপর। একথা প্রায় সকলেই জানেন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও আরও বহু নদীর যুগ যুগ ধরে অবক্ষিপ্ত পলির সঞ্চয়ের ফলে। ভূ-তত্ত্বীয় বিচারে এ অঞ্চল ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের তুলনায় অনেক নবীন। মাটির ক্ষয়-প্রবণতা তাই এরাজ্যে অনেক বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ অঞ্চলের প্রায় সব প্রধান নদীর সরণশীলতা। গঙ্গা বা তার শাখা নদীগুলিই শুধু নয়, অন্য প্রধান নদীর প্রবাহ-পথ বারবার অতীতে বদলেছে। এই বদলের ফলে নদীর অভ্যন্তরীণ স্রোতবিন্যাসও পালটেছে। আসলে এ রাজ্যে সব নদীই অস্থির। ভূ-তত্ত্বের সুস্থিতি না হলে নদীর প্রবাহ-পথও পরিবর্তিত হতে থাকবে আর তাই ভাঙনও থেমে থাকবে না। যদি না যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

নদীর এই অস্থিরতা ও নদীর সন্নিহিত মৃত্তিকা স্তরের ক্ষয়শীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের নদীকে অবরুদ্ধ করে সামাজিক স্বার্থে তাদের কাজে লাগানোর নিরন্তর প্রয়াস।

বাঁধ দিয়ে এবং নানা উপায়ে নদীকে বেঁধে তাকে বশীভূত করতে চাইছি আমরা। নদীর মর্জিকে যাঁরা বোঝেন, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে নদী কোনো প্রাণহীন জলধারা মাত্র নয়। জীবন্ত প্রাণীর মত সে-ও স্বাধীন থাকতে চায়, কোনো প্রতিবন্ধকতাকেই সে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয় না।

যাঁরা নদীর কাছে থাকেন, তাঁরা জানেন যে ভরা নদীতে নদীর পাড় সাধারণত ভাঙে না। বর্ষার পরে জলস্তর নেমে গেলে শুরু হয় নদীর পাড়-ভাঙা। নদী যখন কানায় কানায় ভরা, তখন জল ঢুকে যায় তীরভূমির অভ্যন্তরে। জল কতটা ভেতরে ঢুকবে তা নির্ভর করে মাটির ভেদ্যতার (Permeability) ওপর। মাটির অভ্যন্তরে ঢুকে জল মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টি করে চাপ (pore pressure) । নদীর জলস্তর নেমে গেলে মাটির অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট জল মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাপ দেয় বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। যতক্ষণ জলস্তর উঁচু থাকে, ততক্ষণ পাড়ের ভেতরে-ঢোকা জল বেরিয়ে আসতে পারে না নদীর জলের বিপরীতমুখী চাপের কারণে। অন্যভাবে বললে বর্ষার সময় যখন নদী জলপূর্ণ থাকে, তখন পাড়ের ভাঙনের ক্ষেত্রে সাময়িক সাম্যাবস্থা থাকে। বর্ষার পরে জলস্তর নেমে গেলে এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়, শুরু হয় তীরভূমির স্খলন। মাটি যদি অসংযুক্ত (non-cohesive) হয়, ক্ষয়ের প্রাবল্য হয় বেশি।

নদীর স্রোত যখন ক্রমাগত পাড় ঘেঁসে চলে, তখনও নদীর পাড়ের মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে যায়। অনেক সময় নদীর পাড়ের কাছে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণি। জল ঘুরপাক খেতে খেতে নদীগর্ভের এবং ক্রমশ তীরের মাটি কেটে ফেলে। এছাড়া অঞ্চল-বিশেষে তরঙ্গ-বিক্ষেপও নদীর ভাঙনের অন্যতম কারণ। বায়ু-বাহিত ও পোত-তাড়িত দু'ধরনের ঢেউ যখন পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে, তখন ধীরে ধীরে মাটি আলগা হয়ে ভেঙে যায়। এসবক্ষেত্রে কিন্তু তীরভূমির মৃৎ-প্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে ঢেউ-এর তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতার বড় ভূমিকা আছে।

আগেই বলেছি নদী তার স্বেচ্ছা-প্রবাহের পথে কোনো বাধা বা শাসন পছন্দ করে না। নদীর জল কৃত্রিম উপায়ে বেঁধে রেখে তা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয় ঠিকই, কিন্তু এর ফলে আখেরে নদীর মর্জি ও মেজাজ যায় বদলে। অন্যভাবে বললে এর ফলে নদী-প্রবাহের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়, বদলায় তার ভূ-সংস্থান, তার স্রোতো-বিন্যাস উজানে ও ভাঁটিতে। নদীর মূল স্রোত সরে সরে যায়, বদলে যায় পলি সংবহনের প্রকৃতি ও মাত্রা। নদীর বুকে স্বাভাবিকভাবে উদ্‌ভিন্ন চর ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়, আবার মাথা তোলে অন্য কোথাও। এসব স্বভাব-উদ্‌ভিন্ন চরে মানুষ বাস করতে শুরু করে তাদের অস্তিত্বের তাগিদে আর সরকার এসব চর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে নদীর স্বাভাবিকতায় বাধা সৃষ্টি করেন। ঠিক এমনটিই হয়েছে মালদা জেলার ভুতনি দিয়ারায়। ফরাক্কায় জল অবরোধের ফলে গঙ্গার স্রোতবিন্যাস বদলে গিয়ে উদ্‌ভিন্ন হয়েছে ছোট ছোট চর।

ভূতনির চারপাশ সরকার বেঁধে দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিবর্তিত স্রোতেবিন্যাসের ফলস্বরূপ গঙ্গা তার পূর্বতীর ঘেঁসে বইতে শুরু করেছে। মালাদার পঞ্চানন্দপুরে ভাঙনের মূল কারণ নদীর এই বামাগতি!

আগেই বলা হয়েছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে ঐ দুই নদী ও এদের উপ ও শাখানদীগুলির ক্রমাগত পলল অবক্ষেপের ফলে। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌দের অনুমান যে আজকের বঙ্গোপসাগর অতীতে (ক্রেটেশাস কল্প থেকে আনুমানিক তেরো কোটি বছর আগে থেকে শুরু করে টার্শিয়ারি কল্পের সূচনাকাল পর্যন্ত অর্থাৎ আনুমানিক ৬.৫ কোটি বছর পর্যন্ত) অসম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। খাসিয়া পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া সামুদ্রিক জীবাশ্ম এই অনুমানকে সমর্থন করেছে। গঙ্গার দক্ষিণাভিমুখী প্রবাহ-পথের অববাহিকা ছোটনাগপুরের শিলাস্তরের সঙ্গে যুক্ত। এই ভূ-শিলার আদি শুরুটি ক্রমশ অবনত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বে। এর ফলে অবনত শিলাস্তরটির ওপর পলল সঞ্চয় সহজ ও দ্রুত হয়েছে। তার ওপর এই অববাহিকার নিচে যে অবতল ভঙ্গ শেষ হয়েছে, তা আজও সচল থাকায় পলি উপচয়ের সঙ্গে ভূমি ক্ষয়ও হয়ে চলেছে এ অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গ ও সন্নিহিত বাংলাদেশে নদীসমূহের দোলাচলতার এটাও একটা কারণ। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় (এস. গার্টনার কৃত) প্রকাশ পেয়েছে যে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে পলল সঞ্চয়ের হার হঠাৎ-ই বেড়ে যায় প্রায় ৮ লক্ষ বছর আগে। পলি সঞ্চয়ের যে হার আগে ছিল প্রতি দশ লক্ষ বছরে ২০ থেকে ৭০ মিটার ঐ সময়ের পর থেকে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি দশ লক্ষ বছরে ২০০ মিটারের কাছাকাছি। অনুমান ঐ সময়টা ছিল হিমালয়ের সুস্থিত হবার পর্ব; যে কারণে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ও মৃৎসঞ্চয় গাঙ্গেয় বদ্বীপে হয়ে থাকবে।

গাঙ্গেয় নিম্ন সমভূমির দক্ষিণাংশে আবৃত রয়েছে দোআঁশ মাটি। সাগর সান্নিধ্যে এই মাটি হয়েছে লবাণাক্ত। ফলে, মাটির রূপই বদলায় নি, প্রকৃতি তার সজ্জারও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে তাই দেখা যায় লবণাম্বুজ নানা উদ্ভিদের (mangrove) প্রাধান্য। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে রয়েছে ল্যাটেরাইট যুক্ত রাঙা মাটি। এর পাশাপাশি আছে প্রস্তরজীর্ণ রুক্ষ বেলেমাটিও। আবার হিমালয়ের পাদদেশে খরস্রোতা অসংখ্য নদীবাহিত গিরিজাত নানা ধাতু মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে। এখানে প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠেছে গহন অরণ্য। মাটির প্রকৃতির এই ভিন্নতা নদীর ক্ষয় প্রবণতার নিয়ামক। গঙ্গার পূর্বদিকের অঞ্চলে অসংবদ্ধ ভূ-স্তর থাকার ফলে এ অঞ্চলে তুলনায় অনেক বেশি ক্ষয়শীল। পশ্চিমদিকের ভূ-প্রকৃতি প্রাচীনতর এবং মৃৎস্তর সংবদ্ধ হওয়ার ফলে গঙ্গা কেবলই পূর্বদিকে সরে যেতে চায়। ভাঙনের প্রাবল্য নির্ভর করে নদীর গর্ভ ও তীরের মৃৎস্তরের প্রকৃতির (lithology) ওপর। গাঙ্গেয় নিম্ন সমভূমির ভূ-পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে ঐ অঞ্চলে পলির আস্তরণ ছ'শো মিটারের বেশি। কলকাতার নিচে যে উদ্ভিজ জ্বালানির (peat) স্তর পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স সাড়ে তিন হাজার

বছরের বেশি নয়। হুগলি নদীর উভয় তীরে মাটির নিচে ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশ ফুটের মধ্যে পীটের স্তর পাওয়া গিয়েছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন, এই পীটের শুরু কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আস্তৃত রয়েছে। উল্লেখ্য, এই পীটই কয়লার আদি রূপ। চাপ ও তাপের দ্বৈত প্রভাবে পীট ক্রমশ লিগ্‌নাইট ও কয়লায় রূপান্তিরত হয়।

ভাঙনের একটা বড় কারণ নদীর বাঁক নেওয়ার প্রবণতা। ভূ-তত্ত্বীয় বিচারে নবীন নদীর মধ্যে যেন কৈশোরের চাপল্য! এঁকেবেঁকে পথ চলাতেই তার আনন্দ। প্রবাহের এই বংকিমতা কিন্তু নদীর অহেতুক স্বেচ্ছাচারিতা নয়। এ ব্যাপারে নদী-বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবেছেন। কেউ বলেন, ঢালের আধিক্যের জন্য নদীর তার প্রবাহ-পথ এঁকেবেঁকে দীর্ঘ করে ঢালের অতিশয়তা হ্রাস করে। আবার কারোর কারোর ধারণা, নদীর বাঁক নেওয়ার কারণ ঢালের আধিক্য নয়, ন্যূনতা। নদী যখন ঢালের ন্যূনতার কারণে ভেসে আসা পলির মত রিক্ত ভাঁর বইতে পারে না, তখন সে সুবিধামত একটা পাড়ের কাছে পলি ফেলতে থাকে। এর ফলে নদী বাঁক নিতে চায় অন্য কূলে। নদী-বাহিত পলি, জলপ্রবাহের পরিমাণ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর ঢালের মাত্রাই নদীর বক্রতার নিয়ামক। পরে স্টার্নবার্গ, স্কক্‌লিট্‌স্‌খ প্রমুখ নদী-বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে পলল কণার ব্যাসেরও নদীর বাঁক নেওয়ার ব্যাপারে অবদান আছে।

আসলে ঢালের আধিক্য বা ন্যূনতার চাইতে নদীর উচ্চ ও নিম্নগতিতে ঢালের পার্থক্যই নদীর বাঁক নেওয়ার প্রধান কারণ। উচ্চ গতিতে ঢালের অতিশয়তা (steepness) নদীর ক্ষয়কারী শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। নদীর স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলে নানা ধরনের পলল। নিম্নগতিতে নদীর স্রোত যখন মন্থর হয়ে যায় ঢালের ন্যূনতার কারণে তখনই শুরু হয় নদী গর্ভে ও কূলে পলি-সঞ্চয়। ফ্রিড্‌কিন আবার দেখিয়েছেন যে নদীর অভ্যন্তরে উদ্‌ভিন্ন চর ও নদীর পাড়ের মধ্যে পলি-বিনিময় হয়ে তার গতিপথ বদলে যায়। এই বিনিময় প্রক্রিয়া খুব সরল নয়। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে এ-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি না।

একটা কথা অবশ্য সব নদী-বিজ্ঞানীই মেনে থাকেন যে নদীর পলিভারের একটা সাম্যাবস্থা আছে। এই সাম্যাবস্থার তাৎপর্য হল—নদীবাহিত পলল-ভার এবং প্রবাহের পরিমাণ বা মাত্রা ও দৈর্ঘ্য-বরাবর ঢালের সৌষম্য ও সঙ্গতি। বিষয়টি যত সংক্ষেপে ও সহজে বলা গেল, আসলে তা তত সরল নয়। যা হোক, এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে শুরু হয় নদীর বাঁক নেওয়া। একবার নদী বাঁক নেওয়া শুর করলে তার উত্তলকূলে (convex bank) সঞ্চিত হতে থাকে পলি, আর বিপরীত তীরে শুরু হয় ক্ষয়। কেউ কেউ (যেমন এইচ. এন আইনস্টাইন, লি. এন. ন) এ-ব্যাপারে জোর দিয়েছেন নদীর স্রোত-বিন্যাসের ওপর। এঁদের মতে সর্পিল শাংকরাকৃতি (heli coidal) স্রোতই নদীর বক্রগতির কারণ।

নদীর ভাঙনের মূলে বড় কারণগুলি আছে, সে-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা

গেল। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে নদীর ভাঙন প্রতিরোধ করতে গেলে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থায় কাজ হবে না; বুঝতে হবে নদীর ঔদিক বৈশিষ্ট্য, পলিকণার প্রকৃতি, তার স্রোতবিন্যাস এবং সর্বোপরি নদী-গর্ভ ও নদীকূলের মাটির স্তরসজ্জা ও প্রকৃতি (lithology & straingraphy)।

এবারে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদীর প্রবাহ-পথের স্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প শেষ হবার আগের ও পরের গঙ্গার পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। ফরাক্কার উজানে ও ভাঁটিতে গঙ্গার পথ বদল ও ভাঙনের খেলায় ছেদ পড়েনি। ফরাক্কায় ব্যারাজ নির্মিত হবার আগে থেকেই গঙ্গার বুকে গজিয়ে উঠেছিল একাধিক চর যা কালক্রমে প্রসারিত ও উন্নত হয়েছে। এইসব চরে বহু মানুষ ঘর বেঁধেছিলেন, শুরু করেছেন কৃষিকার্য মৎসচাষ। নদীর প্রবাহ এইসব চর এড়িয়ে মেয়েদের চুলের বিনুনির মতো (braided flow) এঁকে বেঁকে পথ করে নিয়েছে। মালদা জেলায় ভুতনি দিয়ারার চরটি সুস্থিত। রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর এই চরটির চারপাশ বাঁধিয়ে দিয়েছেন এখানকার অধিবাসীদের স্বার্থে। পরে এই চরের ভাঁটিতে উদ্‌ভিন্ন হয়েছে একাধিক ছোট ছোট চর। মাথা তুলেছে ডাকাতিয়া চর এবং তারও সঙ্গে আরও একটি। এই দুটি নবোদ্‌ভিন্ন চরের জন্য গঙ্গা প্রবাহ এখন মালদা জেলার পাড় ঘেঁষে বইছে। কোনো কোনো স্ব-ঘোষিত বিশেষজ্ঞ বলছেন যে এর ফলে গঙ্গার মূল-প্রবাহ তার পুরোনো পাগলা নদীর খাত বেয়ে বইতে শুরু করবে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে আসার পর আমার মনে হয়েছে আশু সে সম্ভাবনা নেই। নদীপ্রবাহের অন্তর্বিন্যাসের সাময়িক পরিবর্তনে গঙ্গার প্রবাহ-পথটাই আমূল বদলে যাবে—এমন দূরদর্শী ভাবনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে সহমত পোষণ করি না। এর কারণ গঙ্গাগর্ভ বর্তমানে পাগলানদীর গর্ভতল থেকে অন্তত ১৫ মিটার নিচে। ভুতনির নিচে ডাকাতিয়া চরের পশ্চিমদিক দিয়ে বর্তমানে বইছে গঙ্গার মূল প্রবাহটি যা ডাকাতিয়া চরের নিচে নতুন মাথা-তোলা অনামী চরটির পূর্বদিক দিয়ে পথ করে নিয়েছে। আসলে ঐ অঞ্চলে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের মৃৎপ্রকৃতি প্রাচীনতর, কঠিন ও সুস্থিত। গঙ্গা তাই বিহার-সংলগ্ন তীরভূমি এড়িয়ে ক্ষয়প্রবণ ও নবীন পূর্বপাড়ের দিকে বইতে চাইছে। তাই যেটা প্রয়োজন তা হল গঙ্গার অস্থির প্রবাহের দিশা ঠিক করে দেওয়া (guidance to flow)। সাময়িক তটসংরক্ষক ব্যবস্থায় আখেরে ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। রাজ্য সরকার এছাড়া মালদার দিকে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে ফি-বছর বন্যারোধক বাঁধ নতুন করে তৈরি করছেন একটু একটু পিছিয়ে; কিন্তু তাতে তো কাজ হবার কথা নয়। তার ওপর গঙ্গার 'অরক্ষিত' অঞ্চলে বাসা বাঁধেন যাঁরা তাঁরাই নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হন। সরকার যদি দূরে কোনো নিরাপদ অঞ্চলে এঁদের পুনর্বাসন দেন, তবে ক্ষতির পরিমাণ কমে।

দূর-সংবেদ প্রক্রিয়ায় উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে গঙ্গার ভাঙন আরও পূর্বভিসারী হতে পারে, যদি এখনই গঙ্গার মূল প্রবাহকে পশ্চিমে সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়। এর অর্থ এই নয় যে গঙ্গা অবিলম্বে তার পুরানো খাতে বইতে শুরু করবে। সমস্তটাই নির্ভর করছে গঙ্গা-প্রবাহের অন্তর্বিন্যাস শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়াবে। সরকারি প্রচেষ্টা ও প্রাকৃতিক প্রবণতার সংঘাতে শেষ পর্যন্ত নদীই ঠিক করে নেবে তার প্রবাহপথ। নদী-প্রবাহকে নতুন পথ দেখানোটা তাই এ মুহূর্তে জরুরি। ভুতনি দিয়ারার ভাঁটিতে মালদা সন্নিহিত প্রণালীর মধ্যে একটি গভীর খাত সম্প্রতি লক্ষ করা গিয়েছে। এই খাত বরাবর যথাস্থানে পলিখনন এবং সেই সাথে বাঞ্ছিত পথে মূল প্রবাহকে চালিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিলে মালদার দিকে ভাঙন কমবে বলে আশা করা যায়। ডাকাতিয়া চরের দক্ষিণে এবং নবোদ্‌ভিন্ন চরটির উত্তরে প্রবাহ চালক প্রাচীর (guide wall) নির্মাণ করলে কাজ হতে পারে। মোট কথা মূল প্রবাহকে পলি খননের প্রস্তাবিত পথে চালনা করা দরকার। এছাড়া যথাস্থানে প্রতিসারক (spar) নির্মাণ করে প্রবাহকে পাড় থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যাই করা হোক, যথার্থ সামূহিক প্রতিমান সমীক্ষার (simulation studies) পরে যেন তা করা হয়। আন্দাজে ও বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে কোনো বড় নদীকে বশে আনা যায় না। ফরাক্কা ব্যারেজের ঠিক উজানে জলাশয়ের গভীরতাও বিপজ্জনকভাবে কমেছে পলি জমে জমে। ব্যারেজের জলাশয়টিকেও আশু পলিমুক্ত করা জরুরি।

ফরাক্কার ভাঁটিতে ফজিলপুরের কাছে পদ্মা ও ভাগীরথীর (ভাগীরথীর আসলে গঙ্গার একটি শাখা) ক্রম-সান্নিধ্য আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি প্রবাহ পথের ব্যবধান এখন এক কিলোমিটারেরও কম। ভাগীরথীর গর্ভতল যেহেতু পদ্মার চেয়ে উঁচুতে, দুটি নদী মিলে গেলে সব জলই পদ্মা দিয়ে বইতে থাকবে। দুই নদীর ক্রম-সান্নিধ্যের অনেক কারণের একটি হল বাংলাদেশে রাজশাহীর কাছে শ্রেণিবদ্ধভাবে প্রতিসারক নির্মাণ,যার ফলে প্রবাহ সরে এসেছে ভারতের দিকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাগীরথীর পূর্বাভিসরণের প্রবণতা। এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে না পারলে সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা।

এখানে বলা দরকার, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরের ৭৪.৫ কি.মি. এবং বাঁ পাড়ের ৩১.৯ কিমি ক্ষয়প্রবণ বলে চিহ্নিত। হুগলি নদীর (জলঙ্গী সঙ্গম থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভাগীরথীর নাম) দক্ষিণ দিকের ৫.১ কি.মি. ও বাঁ ধারের ১৫.৯ কি.মি. ক্ষয়শালী বলে শনাক্ত করা হয়েছে হুগলী নদীর। ডান দিকে তীর বরাবর শহর অঞ্চল ও বড় বড় কলকারখানার বাহুল্য। এজন্য ডানদিকের তটকে আগে থেকে সুরক্ষিত করতে ক্ষয়রোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে নদীর ডান তীরের মৃৎপ্রকৃতি কঠিনতর হওয়ায় কম ক্ষয়প্রবণ।

কিছুদিন আগে ড. এস. কে. দাস ও পি. কে পাড়ুয়া হুগলি-ভাগীরথীর ২২টি অংশের দু'তীরের ৪৪টি জায়গায় পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে সাধারণভাবে বক্রিমা ব্যাসার্ধ ও জলকণা নদীর প্রসারের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পর্যন্ত নদীর তীর সুস্থিত থাকে। নতিকোণ (slope angle) মাটির সংযুক্তি (Cohesiveness) তার ঘনত্ব ও গভীরতা এবং তার ভেদরোধিতা (penetrations resistance) নদীতীরের ভূমিক্ষয়কে প্রভাবিত করে। এই সব নিয়ামক কারণগুলি ধরে নিয়ে ঐ দুই গবেষক বলেছেন যে ভাগীরথীকে জঙ্গিপুরের ডান পাড়, পলাশী ও বহরমপুরের মাঝের অঞ্চল, মঝ্ঝমপুরের বাঁ তীর, রঘুনাথপুরের বাঁ-পাড়, মায়াপুরের বাঁ-ধার, মায়াপুরের ভাঁটিতে রাওথাড়ার দুটি তীর; সমুদ্রগড়ের ডান পাড়, বলাগড়ের দুটি ধার, উলুবেড়িয়া সাঁকারাইলের ডান দিক এবং ফলতার বাঁ-ধার বেশি ক্ষয়প্রবণ। একটি পরিসংখ্যান বলছে যে প্রতি বছর প্রায় ২০০ হেক্টর জমি ভাগীরথীর-হুগলির নদীগর্ভে তলিয়ে যায় এবং এর ফলে প্রায় ৮৫ লক্ষ ঘন মিটার পলি নদীতে সংবাহিত হয়।

গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদীর ভাঙনের যে ব্যাপকতা তাতে পরিচ্ছিন্ন ও চিরচরিত সংরক্ষণ ব্যবস্থায় স্থায়ী কাজ হতে পারে না। তাই সামাজিক পরিকল্পনা নদীর মর্জি ও অন্যান্য নিয়ামক কারণের পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করতে হবে। পাথরের চাঁই, বাঁশের খাঁচা বেঁধে নদীতে ফেলে গঙ্গা-ভাগীরথীর ভাঙন রোধ করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার—যেমন ভূ-বঙ্গের ওপর প্রস্তর আচ্ছাদন নির্মাণ করতে হবে। প্রারম্ভিক খরচ বেশি হলেও এ ধরনের ব্যবস্থা অনেক বেশি টেঁকসই। সবচেয়ে বড় কথা, নদীর প্রবাহ-পথকে ধীরে ধীরে পাড় থেকে সরিয়ে নদীর মাঝামাঝি জায়গায় আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। এর জন্য দরকার প্রতিক্ষণ সমীক্ষার। বিগত বৎসরগুলির পলিসংবহনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঔদক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গাণিতিক প্রতিরূপ সমীক্ষার ব্যাপারে তো কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। যথাযথ গাণিতিক প্রতিরূপের সাহায্যে নদীর ভবিষ্যৎ প্রবাহ-বিন্যাসের আভাস দেওয়া সম্ভব। নদীর গতি ও প্রকৃতির অপক্ষগতি বিশ্লেষণ না করে সাময়িক লোক-দেখানো ব্যবস্থায় গঙ্গা-ভাগীরথীর ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না। একথা বোঝার ও বোঝানোর সময় এসেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

Einstein H.A & Shen H. W. (1964)
A Study of meandering in straight alluvial Channels (Journal of Geographical Research Vol. 69, Dec 64)
Friedkin JF. (1945)
A laboratory study of the meandering of alluvial rivers (U.S. Waterways Expt. station Vieksburs, Mississipi)

সৌজন্যে : অপরাজিত, জানু-জুন২০০৫